গোবিন্দ হালদার : এক সাগর রক্তের বিনিময়ে... গানের অমর স্রষ্টা

॥ কামাল আহমেদ ॥

বাংলাদেশের অবিস্মরণীয় মুক্তিযুদ্ধের প্রাণসঞ্চারী প্রেরণাদায়ক সেই সাড়াজাগানো গান তথা আমাদের উন্মাদ উন্মাতাল করা গীতি রচয়িতা কবি গোবিন্দ হালদারের চিরস্মরণীয় ... 'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি', 'এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা', 'পূর্বদিগন্তে সূর্য্য উঠেছে রক্ত লাল', 'হুশিয়ার হুশিয়ার বাংলার মাটি', 'পদ্মা মেঘনা যমুনা তোমার আমার', 'চলো বীর সৈনিক অভিযাত্রী' - তাঁর এই সব বলিষ্ঠ এবং অনবদ্য গানের ঋণ কি কখনও আমরা তথা সমগ্র বাংলাদেশ পরিশোধ করতে পারবে?

তখনতো সবে মুক্তিযুদ্ধের শুরু। মুক্তিসংগ্রামরত একটি দেশ এবং সে দেশটি প্রতিবেশী দেশ হলেও শুধুমাত্র ভাষা, আচার-আচরণ এবং সংস্কৃতিগত বহুলাংশে মিল বা সাযুজ্য ছাড়া তার লোকাচার, তার দ্রোহ, তার আন্দোলন-সংগ্রামের প্রায় কোন কিছুরই খবর জানতো না ভারতীয় কিংবা পশ্চিম বাংলার বাঙালীরা। তখন সেটা ছিল পাকিস্তানের অংশবিশেষ। উভয় বাংলার ভৌগলিক সীমান্ত এক হলেও ভিন্ন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীন ব্যাপার বিধায় বহু কিছু জানা সম্ভবপর ছিল না তখন। কুটনৈতিক আচার ছিল সেটাই।

কিন্তু মানুষের ধারাবাহিক ইতিহাস বড় বিচিত্র। কতো জানা-অজানা ঘটনা ও সংগ্রাম-সৃষ্টির সমাহারে ইতিহাস সমৃদ্ধ হয়, আমাদের কাছে স্মরণীয় স্মৃতিরূপে বেঁচে থাকে তার কি কোন হিসেব আদৌ আমরা রাখি? আমাদের প্রাণের রক্তঝরা সে দিনের মরণপণ যুদ্ধে দুরন্ত দুর্বার মুক্তিসেনাদের উজ্জীবক চিরপ্রিয় অতুলনীয় অগুনতি বহুজ্বালাময়ী গান স্বনামে ও বেনামে রচনাকারী প্রণম্য চারণকবি আমার সোদরপ্রতিম বন্ধু শ্রী গোবিন্দ হালদারের আন্তরিক নৈবেদ্য নিবেদনের পূর্বাপর ইতিহাস বিশ্বের বাঙালীদের জেনে রাখা উচিৎ। আমাদের নৈতিক কর্তব্য সেটা। কেননা বাঙালীরা বড় আত্মবিস্মৃত জাতি। অথচ আমাদের মুক্তিযুদ্ধ সংগ্রামে-শৌর্য্যে-সৃষ্টিতে অম্লান ও অদ্বিতীয় এক দৃষ্টান্ত।

বস্তুতপক্ষে কবিগুরুর অনবদ্য রচনা আমাদের চিরকালীন জাতীয় সঙ্গীত... 'আমার সোনার বাংলা''র আবেদনের চেয়ে বন্ধু মরমী কবি গোবিন্দ হালদারের কালজয়ী রচনার অবদান অনেক বেশী এ কারণে যে মুখে-অন্তরে গোবিন্দর লেখা গান আর হাতে অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধের ফ্রন্টে একের পর এক রণাঙ্গন দখল করেছে সেদিন আমাদের অমিতবিক্রমী মুক্তিসেনারা। রবীন্দ্রনাথের মতই আমাদের সবার শ্রদ্ধেয় এবং অনপনেয় ইতিহাসের সঙ্গী ও অচ্ছেদ্য অঙ্গ শ্রী গোবিন্দ হালদার - এ কথা অনস্বীকার্য্য।

বাংলাদেশের মুক্তির আস্বাদবার্তায় বিকশিত - একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে ঘোষণার মরণপণ সংগ্রামে রত এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত অনন্য স্বাধীনতা সূর্য্যের আলোতে উদ্ভাসিত পূর্বদিগন্তে রক্তলাল আকাশের তথা সার্বিক মুক্তির দিশারী কবির চিরভাস্বর সে সব রচনার প্রাক্কালে আবশ্যিক বিধায় তাকে জানাতে হয়েছে তৎকালীন বাংলাদেশের পরিচয় : তার ভৌগলিক অবস্থান, তার অসম অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও প্রতিবাদের ধারা এবং দেশের আভ্যন্তরীণ ধরণ, ধর্ম ও কালের পরিচয় তুলে ধরতে হয়েছে আমাকে নিত্যদিন।

কলকাতার ধর্মতলা (এসপ্ল্যানেড) অঞ্চলের এক গোপনীয় আড্ডাতে অফিস আওয়ার্সের পরে গোবিন্দকে আমার সঙ্গে আলোচনায় বসতে হোত একদম রুটিন মাফিক যার কোন ব্যত্যয় বা ব্যতিক্রম হবার যো ছিল না কারণ সেটা ছিল আমাদের সবার জন্য আপৎকালীন যুদ্ধের নেহায়েত ইমার্জেন্সি কাল। অতএব বিভিন্ন ফ্রন্টের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নির্দেশ পালনে সে সময়ে কোন গাফেলতি করা চলতো না। বলা বাহুল্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তখন আমাকে লেনদেন করতে হতো। সঙ্গোপনে সতর্কতার সাথে কর্তব্য সমাপনান্তে কাজের রিপোর্ট যার কাছে আমায় দিতে হতো তাকে গোবিন্দের মোটামুটি বিশ্বস্ত একটি বায়ডাটা জানাতে হয়েছিল নাহলে বিশ্বস্ততার উপর ভরসা করবে কেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ?

এসব শর্ত মেনেই মহা উদ্যমে সবাইকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে যেতে হতো। উপায় ছিল না এ ছাড়া। যে জন্যে আমি প্রথম প্রথম শত আন্তরিক অনুরোধ সত্ত্বেও গোবিন্দকে কিছুতেই স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের অতীব গোপনীয় ঠিকানায় তখনকার ৫৭/৮ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের দ্বিতল বাড়ীটাতে নিয়ে যেতে পারিনি। অস্থায়ী সরকারের সহানুভূতি, সম্মতি এবং বেতারকেন্দ্রস্থ দায়িত্ববান আমার প্রিয় বন্ধু ও সুহৃদদের সহায়তায় পরে যথাসময়ে অবশ্য গোবিন্দ হালদার স্বনামধন্য ও বাংলাদেশের প্রথম স্বীকৃত শ্রেষ্ঠ গীতিকার হিসাবে সেখানে যাতায়াতের অনুমতি পান সসম্মানে। খুব আনন্দ লাভ করি তাতে আমি তার অন্যতম শুভার্থী হিসাবে।

বাড়ীটাতে যে কোন সময় অর্ন্তর্ঘাতী আক্রমণ হতে পারে আশঙ্কায় খুব রেখে ঢেকে চলা হতো। অথচ বাড়ীটার অবস্থান ছিল সবার চোখের সামনেই। এক বিশাল মহিষের খাটালের পাশে অলক্ষ্যনীয় প্রায় এক দ্বিতল। ছিমছাম বাড়িটাতে হরদম লোকে যাতায়াত করলেও কেউ জানতো না ওটাই গোপনে স্বাধীন বাংলার বেতার কেন্দ্র। বাড়িটিকে জানতো সবাই সাংবাদিকদের মেসবাড়ী হিসেবে যেখানে সবাই দিনরাত খসখস করে শুধু অনেক কিছু লিখতো, লিখতো আর লিখেই যেতো। খেতো আশেপাশের অস্থায়ী বস্তীওয়ালাদের হোটেলে। কারো বালিশ কিম্বা চাদর তেমন ছিল না। আর বিছানাপত্তরের বালাইতো নেই। থাকারও কথা না তখন। কে কার দিকে তাকায়! যে যার কাজ করে যাচ্ছে রুটিনমতো। সবার পরিচয়ও যে সবাই জানতো তাও নয়। সেটা নিয়মও ছিল না। বিশেষ কোন কারণে সকলের দু'নম্বরী অর্থাৎ ছদ্মনাম ছিল একটা।

আজ এতকাল পরে এই সত্তোরোর্ধ বয়সের ভারে ক্লান্ত আমি মন্ত্রিয়লের মানুষের ময়দানে মনে পড়ছে, আহা! আমার সেদিনের সতীর্থ-বান্ধবেরা আজ অনেকে হয়তো ফিরে গেছেন লোকান্তরে, অনেকে আজও লোকালয়ে বেঁচে-বর্তে থাকলেও দেশের পরিস্থিতিজাত অস্থিরতার অরণ্যে অল্পবিস্তর দিশেহারা, হয়তো আমারই মতো বিভ্রান্ত বিপর্য্যস্ত তারা সবাই।

ভুলতে পারি না যেদিন আমার দেওয়া নানা তথ্যমূলক বইপত্রপুস্তিকা সঙ্কলন (মূলতঃ ২১শে ফেব্রুয়ারীর)গুলি ফেরৎ দেবার সাথে সাথে আমাদের প্রায় দুই মাসকালীন অন্তরঙ্গ আলোচনার ফলস্বরূপ তার লেখা গানের একটা খাতা দিল সে আমায়। চমৎকার তার হাতের লেখায় তার লেখা অনেকগুলো গানের মাঝে 'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে' গানটি শুধু তার নিজেরই নয়, আমাদের সবার দৃষ্টি কেড়েছিল। স্বাধীন বাংলা বেতারের পুরোধা প্রধান সংগঠক ছিলেন আমার ভাতৃসম বেলাল মোহাম্মদ, প্রধান প্রকৌশলী শাকের, সংগঠক দপ্তর প্রতিবেদক শহীদুল ইসলাম (মরহুম) এবং বহুদিনের সহযোদ্ধা সতীর্থ প্রিয় বান্ধব সাংবাদিক কামাল লোহানী প্রমুখেরা ভূয়সী প্রশংসাসহ এক কথায় গোবিন্দের অন্তর-উৎসারিত রচনার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন। কিন্তু এই সব কর্মকর্তাদের কেউই গোবিন্দকে গোপন বেতারকেন্দ্রে সাদরে অভ্যর্থনা করার ক্ষমতা রাখতেন না যদিও সেটা তার একান্ত কাম্য ও প্রাপ্য ছিল। কারণ তিনি তখন আমাদের সমবেত সাহায্যে বেতারের অবিসম্বাদিত গীতিকার। তাকে অবশেষে ওখানে নিয়ে যেতে আমাকে ভিন্নপথ ধরতে হয়েছিল। সেটা আজ আর বলা যাবে না।

পরম প্রীতিভাজন বন্ধু স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র স্থাপনের অন্যতম নেতা এবং তদসংক্রান্ত মূল্যবান পুস্তক রচয়িতা বেলাল মোহাম্মদ বহুবার বলেছেন, লিখেছেন যে তার নানা সন্দীপের সুসন্তান ও গৌরব ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা পিতা কমরেড মুজাফফর আহমেদ মরহুম তখনও কলকাতায় জীবিত, তিনিও কৌতুহলী ছিলেন স্বাধীন বাংলার বেতার কেন্দ্রটি আসলে কোথায় জানার জন্যে। সেটা কি কলিকাতা আকাশবাণী অফিসেই? এ রকম কৌতুহল

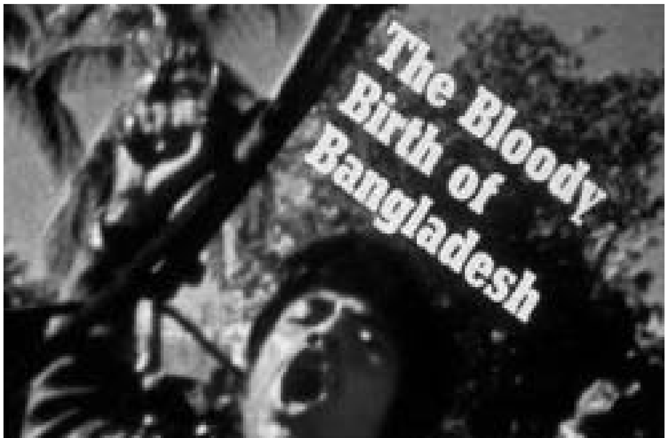

এক সাগর রক্তের বিনিময়ে... গানের অমর স্রষ্টা

লেখক কামাল আহমেদ ও কবি গোবিন্দ হালদার

সে সময় অনেকেরই ছিল। খুবই জনপ্রিয় ছিল স্বাধীন বাংলা বেতারের বিভিন্ন সব প্রোগ্রাম - যা আকাশবাণীর কোনও কালে ছিল না। গোবিন্দরও প্রথম প্রথম ধারণা ছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের আলাদা কোন অস্তিত্ব বা অফিস নেই। বিস্ময়কর ছিল সেটাই। ভারতীয় বেতার প্রকৌশলী পদকর্তাদের অবাক অভিজ্ঞতা হয়েছিল মুক্তিপ্রয়াসী আমাদের অপরাজেয় শব্দসৈনিকদের কাণ্ডকারখানায়।

ততদিনে কণ্ঠশিল্পীদের অনেকেই কলকাতায় এসে পৌঁছেছেন। গায়ক-গায়িকাতো অনেকেই আছেন কিন্তু গীতিকার নেই। যারাও বা আছেন তারা কেউই পূর্ববাংলার সন্তান নন। দেশটার মাটি আর মানুষ সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই নেই। অসংখ্য মানুষের ঢল দেখে আবেগে আপ্লুত বহু গীত রচয়িতাই সংগ্রামের সাথে সম্পর্কহীন আবোল তাবোল লিখতে গিয়ে ব্যর্থ হলেন। চলচ্চিত্র জগতের অন্যতম সেরা গীতিকার পাবনার সন্তান বিখ্যাত গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারও তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু উপহার দিতে পারলেন না সংগ্রামী বাংলার অনমনীয় সূর্য্যসন্তানদের। মাত্র একটি গানই তার গ্রহণীয় হলো : 'শোন একটি মুজিবরের কণ্ঠ হতে ...' যার জন্য বঙ্গবন্ধুর তরফ থেকে তার জন্য সোনার পদক পুরস্কার ঘোষণা করা হয় অথচ বেচারী গোবিন্দ হালদারের সেই সব শাশ্বত ঐতিহাসিক গানগুলোর জন্যে তাকে এ যাবৎ কোন সরকার কোনও ভাবে পুরস্কৃত করেনি। আশ্চর্য্য! তাকেতো ইতিমধ্যেই স্মরণীয় একুশে পদক, বাংলা একাডেমী পদকসহ অন্যান্য পুরস্কারে বরণ করা উচিৎ ছিল। এখনও সময় আছে, কারণ বহু দেরী হয়ে গেলেও কবি আজও বেঁচে আছেন - আমাদের সৌভাগ্যক্রমে। নাহলে আমাদের সেই স্বোপার্জিত পাপকে স্বয়ং দয়াময়ও ক্ষমা করবেন না। দেশের নানা দিবসপূর্তিতেও তাকে স্মরণ করে কি কেউ? না, করে না। কোন আমলা, কোন রাষ্ট্রনেতা, কোন সংস্থা, কোন রাজনীতিবিদ, কোন সেনাপতি, কোন লেখক-গবেষক, কোন ঐতিহাসিক, কোন মন্ত্রীপ্রবর এমনকি কোন রাষ্ট্রপতি আজ পর্যন্ত এই আপোষহীন দরিদ্র মেধাবী সরল মেরুদণ্ডী মানুষটিকে স্মরণ করেননি। কেন? সেটাই প্রশ্ন আমার। কলকাতারই প্রান্তে বাংলাদেশের এমন এক ঐতিহাসিক পুরোধাপুরুষ অবহেলিত হয়ে পড়ে আছেন। বাংলাদেশের কোন দিবসেই তাঁকে কখনও আমন্ত্রণ করা হয় না বলে শুনেছি।

আজ থেকে ১৫/১৬ বছর আগে মাহফুজুল্লাহ সাহেব তখন ফার্ষ্ট সেক্রেটারী কলকাতায়। ঢাকা থেকে গেছি আমিও কলকাতায়। পরদিন গোবিন্দ এলো বাড়ীতে দেখা করতে। কি যেন মনে হতে আমার সঙ্গেই তাকে নিয়ে সাত সকালে বন্ধুবর মাহফুজুল্লাহ সকাশে উপস্থিত হলাম। হায় আল্লাহ! সরু ক্যাঁকলাস কালো চেহারার টেকো একটা গোবেচারা অদর্শনীয় মানুষ গোবিন্দকে দেখে সারা অফিসময় হৈচৈ পড়ে গেল! এই সেই বিস্ময়কর ব্যক্তি! যার গানে মুক্তিযোদ্ধারা উন্মাতাল, উদ্বেল হতো? অফিসের সবাই তাকে শুভেচ্ছা দিতে এগিয়ে এলো। দেখে অশ্রু সম্বরণ করতে পারলাম না। ধন্যবাদ মাহফুজুল্লাহকে। সেই প্রথম আর বোধ হয় গোবিন্দর অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ হাই কমিশনার তাকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ডাকার ব্যবস্থা করে কৃতার্থ করলেন। বর্তমানের সরকারের আমলে তাও রদ হয়ে গেছে। এর আগের সরকারের আমলেও তার ভাগ্যে কোন সিকেই ছিঁড়েনি। স্বাধীনতার স্বপক্ষ কিম্বা বিপক্ষ শক্তির দম্ভোক্তির আড়ালে এদের শ্রেণীচরিত্র একই : গণবিরোধীতা।

গোবিন্দর এহেন অনুল্লেখ্য চেহারাসুরতের জন্যে আপেল মাহমুদও তাকে জীবনে তাদের প্রথম সাক্ষাতে চিনতে পারেনি। আমাদের তিনজনের দেখা করার কথা ছিল এক জায়গায়। আমি যেতে পারিনি। আপেল আর গোবিন্দ দু'জনেই সেখানে উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু কবিসুলভ দিব্যকান্তি সুন্দর সুপুরুষের স্থলে নেহাৎ ছাপোষা নিম্নবিত্ত কেরাণীসুলভ চেহারার আড়ালে গোবিন্দ হালদারকে চেনা মুস্কিল বটে। অথচ তারই লেখা গান গেয়ে আজ বিশ্বময় বাংলাদেশীদের কাছে খ্যাতি অর্জন করেছে আপেল। বলা বাহুল্য এই বিখ্যাত গানটিতে সুরারোপ করার কৃতিত্বও আপেলের।

একটি জাতি বা দেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন মার্চ সঙ্গীতে সুরদান খুব সহজ কাজ নয়। গণসঙ্গীত জগতে শ্রদ্ধেয় হেমাঙ্গ বিশ্বাস, সলিল চৌধুরী, সুধীন দাশগুপ্তের সঙ্গে আমরা সে কারণেই কথা বলি। আবার এর উল্টো ধারার প্রবাদতুল্য কণ্ঠশিল্পী নজরুলশিষ্য শ্রী ধীরেন্দ্র মিত্রের কাছেও যাই আমরা। এঁরা আজ কেউই বেঁচে নেই। সবাই এরা ছিলেন আমাদের মুক্তিসংগ্রামের সমর্থক সাহায্যদাতা। আমাদের দুর্ভাগ্য সে সময় সুধীন বাবু অসুস্থ ছিলেন। গণসঙ্গীতে আমাদের সর্বজনশ্রদ্ধেয় হেমাঙ্গ দা'র আবার সনাতন ধারার ফোকলোরে ছিল পারদর্শীতা। ঠিক মনের মতো হবে না সে আশঙ্কায় তিনি শেষ পর্যন্ত সলিল চৌধুরীর কাছেই যেতে বল্লেন।

সে সময় কলকাতায় চিত্রজগতের কিছু ধান্দাবাজ, মুক্তিযুদ্ধের মনগড়া সব উদ্ভট কল্পকাহিনী-ভিত্তিক ছবি তৈরী করে রাতারাতি বড়লোক হতে চাইছিল। সে ধরনের কিছু নচ্ছার টাউট প্রডিউসার-ডিরেক্টরও আমার এবং গোবিন্দর পিছু লাগল। সমস্ত গানগুলো তখনই কিনে নিয়ে তারা মুক্তিযুদ্ধের উপর বাজার-চালু ছবি তৈরী করে বিক্রি করতে চাইছিল। জনৈক চশমাব্যবসায়ী উমাপ্রসাদ নাকি একদা ঋত্বিক ঘটকের সুযোগ্য (?) সহকারী ছিলেন। তিনিও নেমে পড়লেন মুক্তিযুদ্ধের ছবি করতে। সে এক চরম হাস্যকর পরিস্থিতি। শেষ পর্যন্ত বম্বে থেকে সলিলদা' জানালেন আমাকে : তুই আর দেরী না করে আমার কলকাতার সহকারী প্রবীরকে গানগুলোতে সুর দিতে বল্। সে পারবে। গানগুলো সত্যিই ভাল হয়েছে রে। ব্যস্, তাঁর মতো যথার্থ যোগ্য লোকের নির্দেশ পেয়ে আমরা গিয়ে সুরকার (বর্তমানে প্রয়াত) প্রবীর মজুমদারকে পাকড়ালাম। সলিলদা' বম্বের বড় বড় ব্যানারের ছবিতে ব্যস্ত ছিলেন কিন্তু তাঁর প্রবল আন্তরিক ইচ্ছা ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কোনও না কোন ভাবে অংশগ্রহণ করা। সারাজীবন তো তিনি গণনাট্য সংঘের (আই.পি.টি.এ) মতো বিদ্রোহী আর জনযুদ্ধের সুরারোপে ভারতকে মাতিয়েছিলেন। যে সব সুরের গান ও কথা অমর হয়ে আছে। ভারত তথা আমাদের উপমহাদেশ অমন এক অসাধারণ বড়মাপের গুনী সাচ্চা 'জেহাদী সুরকার'কে আর পাবে না। তার কলকাতার এ্যাপার্টমেন্ট এবং বেহালায় স্থাপিত নিজস্ব বিশাল রেকর্ডিং স্টুডিওতে ছোটাছুটি করেও তার কাছ থেকে সুর আদায় করতে না পারার ব্যর্থতাতো বাকী জীবনভর গোবিন্দ আর আমাকে বহণ করে যেতে হবে জানি। কিন্তু তার যোগ্য সহকারী প্রবীর বাবুও কম যোগ্য ছিলেন না। কলকাতার কিছু বাংলা ছবিতে ভিন্ন ধারার সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে তখনই তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। পৈত্রিক জন্মসূত্রে তিনি বাংলাদেশের সন্তান বিধায় সচেতন সযত্নে অত্যন্ত মনোগ্রাহী সুরদানে তিনি আমাদের মুগ্ধ করলেন।

ঠিক সেসময়ই আপেল আমাকে জোর জবরদস্তি করে ধরে নিয়ে গেল তার বাসায়। সে আর জব্বার তখন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের পিছনের গ্যারেজ ঘরের উপরে কোন রকমে দিন গুজরান করতো আর বম্বেতে সদ্য প্রতিষ্ঠিত বাপ্পি লাহিড়ীর পিছনে ঘুর ঘুর করতো। গায়ক অপরেশ লাহিড়ীর ছেলে বাপ্পি লাহিড়ী তখনই বম্বের বাজার-চলতি ফিল্মী গানে সার্থক। ঘরে ঢুকে দেখলাম, জব্বার একটা কাঁথা মুড়ি দিয়ে এক পাশে শুয়ে আছে। আমাকে বসতে বলে আপেল হারমোনিয়ামটা টেনে নিয়ে শুনিয়ে দিল, 'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে' গানটির আজকের জনপ্রিয় অভিনব সুর। আমি হতবাক হয়ে গেলাম শুনে। বিশ্বাসই হয়নি আমার প্রথমে যে এটি তারই কৃত সুর। এতো চমৎকার, এতো অনবদ্য। সে যাই হোক, বার বার শুনেও বিশ্বাস হচ্ছিল না আমার - আপেলের মতো আনকোরা উদীয়মান একজন গায়ক এমন সুর সৃষ্টি করতে পারে!

তারপর থেকেই আপেল আমাকে চাপ দিতে লাগলো যাতে মূল গীতিকার গোবিন্দ হালদারের সম্মতিটি তার স্বপক্ষে অবশ্যই আদায় করে নিতে পারি আমি। অন্যথায় বেতার কর্তৃপক্ষতো তাকে অনুমতি দেবে না এই সুর ব্যবহার করতে। ফেঁসে গিয়েছিল সে ঐ জায়গাতেই। কি কারণে জানি অনেক কর্তাব্যক্তিই তখন আপেলকে পছন্দ করতো না। যে কারণে ঠিক ওপরে ওঠার পথ খুঁজে পাচ্ছিল না সে। সবার অগোচরে আমি গোবিন্দের সাথে তার আলাপ করিয়ে দিয়ে সুরটা তাকে শোনালাম। বলা বাহুল্য গোবিন্দ মুগ্ধ হয়ে গেল আপেলের সুরটা শুনে। এবং তার পরবর্তী ঘটনাতো বাংলাদেশের আবহমান কালের ইতিহাসের সঙ্গে স্মরণীয় হয়ে গেল।